ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1107- 1116
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.328

প্রযত্ন নীতিবিদ্যার আলোকে মহাত্মা গান্ধীর নারীচিন্তার দার্শনিক বিশ্লেষণ

প্রিয়াঙ্কা সাধুখাঁ, *গবেষিকা, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 13.03.2026; Accepted: 16.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Care ethics has emerged as an important perspective in contemporary moral philosophy, emphasizing empathy, relationships, and moral responsibility as the basis of ethical life. Developed primarily by feminist thinkers such as Carol Gilligan and Nel Noddings, care ethics challenges the dominance of abstract and rule-based moral theories. In the context of Indian philosophical thought, Mahatma Gandhi's views on women have often been interpreted in contradictory ways. Gandhi is sometimes regarded as a thinker who held conservative or even critical views regarding women, as he occasionally pointed out certain limitations in women's social roles and responsibilities. However, such an interpretation does not fully capture the complexity of his thought. This paper argues that although Gandhi criticized certain social conditions and limitations associated with women, he was not fundamentally anti-women. On the contrary, Gandhi frequently emphasized qualities such as compassion, self-sacrifice, patience, and moral strength as distinctive virtues of women, and he incorporated many of these values into his own ethical and political philosophy. By examining Gandhiji's views on women through the framework of care ethics, this paper attempts to demonstrate that his emphasis on non-violence, service, and moral responsibility shows significant affinity with the principles of care ethics. At the same time, the paper critically evaluates the strengths and limitations of Gandhi's perspective within the broader context of contemporary feminist ethical discourse.

Keywords: Care Ethics, Gandhian Philosophy, Feminist Ethics, Women's Liberation, Non-violence, Moral Responsibility

নৈতিক দর্শনের ইতিহাসে দীর্ঘদিন ধরে নৈতিকতার ভিত্তি হিসেবে যুক্তি, কর্তব্য এবং সর্বজনীন নৈতিক নীতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কান্টীয় নীতিবিদ্যা এবং উপযোগবাদী নীতিবিদ্যা এই ধরনের নৈতিক তত্ত্বের প্রধান উদাহরণ। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে নারীবাদী চিন্তাবিদরা এই ধরনের নৈতিক তত্ত্বের সীমাবদ্ধতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁদের মতে, প্রচলিত নৈতিক তত্ত্বগুলো মানবিক সম্পর্ক, আবেগ এবং যত্নের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয় গুলো নিয়ে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে না।[i]

এই প্রেক্ষাপটে ক্যারোল গিলিগান এবং নেল নডিংস প্রযত্ন নীতিবিদ্যার ধারণা বিকাশ করেন। প্রযত্ন নীতিবিদ্যা নৈতিকতার ভিত্তি হিসেবে সম্পর্ক, সহমর্মিতা এবং যত্নকে গুরুত্ব দেয়। প্রযত্ন নীতিবিদ্যার উদ্যোক্তারা মনে করেন যে নৈতিকতা কেবলমাত্র বিমূর্ত নীতির বিষয় নয়; বরং তা মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং দায়িত্ববোধের মধ্য দিয়ে গঠিত হয়।

ভারতীয় নৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তায় মহাত্মা গান্ধীর স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গান্ধী নারীকে কেবল সামাজিক জীবনের অংশ হিসেবে নয়, বরং নৈতিক শক্তির প্রতীক হিসেবে দেখেছিলেন। তাঁর মতে নারীর মধ্যে সহমর্মিতা, সহনশীলতা এবং আত্মত্যাগের যে বিশেষ ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতার মধ্যেই সামাজিক নৈতিক পরিবর্তন ঘটানোর সক্ষমতার বীজ নিহিত রয়েছে।[ii] তিনি বলেন—

> "To call woman the weaker sex is a libel; it is man's injustice to woman. If by strength is meant moral power, then woman is immeasurably man's superior."[iii]

এই উক্তির মাধ্যমেই গান্ধী নারীর নৈতিক শক্তি এবং সহমর্মিতার ক্ষমতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে নারীর মধ্যে যে সহনশীলতা, প্রেম এবং আত্মত্যাগের গুণ বিদ্যমান তা সমাজে নৈতিক পরিবর্তন আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবশ্যই পালন করে।

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো প্রযত্ন নীতিবিদ্যার আলোকে গান্ধীজির নারীচিন্তার একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে তার সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা মূল্যায়ন করা।

নারীবাদী নীতিবিদ্যা ও প্রযত্ন নীতিবিদ্যার ধারণা:

সমসাময়িক নৈতিক দর্শনের আলোচনায় নারীবাদী নীতিবিদ্যা (Feminist Ethics) একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নারীবাদী নীতিবিদ্যা মূলত সেই সকল নৈতিক তত্ত্বের সমালোচনা করে, যেগুলি দীর্ঘদিন ধরে পুরুষকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। নারীবাদী চিন্তাবিদদের মতে, প্রচলিত নীতিবিদ্যায় যুক্তি, নিরপেক্ষতা এবং সার্বজনীন নিয়মকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার ফলে মানবিক সম্পর্ক, আবেগ, সহমর্মিতা এবং যত্নের মতো গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক গুণগুলি অবহেলিত হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটেই নারীবাদী নীতিবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসেবে প্রযত্ন নীতিবিদ্যার উদ্ভব ঘটে।

প্রযত্ন নীতিবিদ্যা (Care Ethics) হল নারীবাদী চিন্তাবিদদের দ্বারা বিকশিত এক গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক তত্ত্ব। এই নীতিবিদ্যায় নৈতিকতার ভিত্তি হিসেবে সামাজিক সম্পর্ক, পারস্পরিক নির্ভরতা, দায়বদ্ধতা এবং সহানুভূতিশীলতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পুরুষতান্ত্রিক সাবেকি নীতিবিদ্যার বিপরীতে নারীবাদীদের দ্বারা গড়ে ওঠা এই নীতিবিদ্যা প্রচলিত নিয়মনীতি ও বিমূর্ত নৈতিক মানদণ্ডের বাইরে গিয়ে প্রত্যেকটি ঘটনাকে তার বিশেষ পরিস্থিতি ও চাহিদার ভিত্তিতে বিচার করার কথা বলে।

পরিণামবাদ কিংবা কর্তব্যবাদী নীতিতত্ত্ব যেখানে সাধারণীকৃত মানদণ্ডের উপর নির্ভর করে এবং নিরপেক্ষতাকে নৈতিকতার প্রধান মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করে, সেখানে প্রযত্ন নীতিবিদ্যা ব্যক্তিগত সম্পর্কের উষ্ণতা, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং ব্যক্তিবিশেষের চাহিদার উপর অধিক গুরুত্ব দেয়। এই নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি মূলত আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক এবং পারস্পরিক নির্ভরতার বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, যেখানে যত্ন, দরদ, সহানুভূতি এবং মহানুভবতাকে গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক গুণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

প্রযত্ন নীতিবিদ্যার প্রবক্তাদের মতে, নারীরা সাধারণত বিমূর্ত নীতি বা তত্ত্বের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করার পরিবর্তে বাস্তব পরিস্থিতি এবং জীবন্ত সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে নৈতিক সমস্যাগুলির সমাধানের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করে। এই প্রসঙ্গে ক্যারোল গিলিগান তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *In a Different Voice*-এ দেখিয়েছেন যে নারীরা নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সম্পর্ক এবং যত্নকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়।[iv] তাঁর মতে প্রচলিত নৈতিক তত্ত্বগুলো মূলত পুরুষকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

পুরুষতান্ত্রিক সাবেকি নীতিবিদ্যায় পুরুষালি বিচারধারাকেই আদর্শ নৈতিক বিচারধারা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে নারীরা যেহেতু প্রধানত পারিবারিক ও গৃহস্থালীর ক্ষেত্রে— যেমন রান্নাবান্না, অতিথি

আপ্যায়ন, শিশু, রোগী ও বৃদ্ধদের পরিচর্যা ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত থাকে— তাই এই কাজগুলিকে তুলনামূলকভাবে গুরুত্বহীন বলে মনে করা হয়েছে। ফলে পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতি নির্ভরশীলতা, দায়িত্ববোধ, আবেগ এবং সহানুভূতিশীলতা প্রভৃতি গুণকে 'মেয়েলি বলে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে।

কিন্তু প্রযত্ন নীতিবিদ্যা এই ধারণার বিরোধিতা করে। এই তত্ত্বের মতে যত্ন করা, সমঝোতা, আত্মত্যাগ, দায়বদ্ধতা, সহানুভূতিশীলতা এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতা কেবলমাত্র নারীর গুণ নয়; বরং এগুলি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের নৈতিক গুণ হওয়া উচিত। এই গুণগুলির গুরুত্ব কেবল ব্যক্তিগত পরিসরেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিসরেও এর বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।

প্রযত্ন নীতিবিদ্যা মনে করে যে সব নৈতিক সমস্যাকে একই নিয়মনীতির আওতায় এনে বিচার করা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ পরিস্থিতি ও মানবিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে সমস্যার বিচার করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো ব্যক্তি তার অসুস্থ স্ত্রীকে সুস্থ করার জন্য আর্থিক অসামর্থ্যের কারণে কোনো ঔষধের দোকান থেকে ঔষধ চুরি করে আনেন, তাহলে সেই ঘটনাটিকে কেবলমাত্র আইনগত দৃষ্টিতে 'চুরি' হিসেবে বিচার করলে সমস্যার প্রকৃত মানবিক প্রেক্ষাপটটি অদৃশ্য থেকে যায়। কিন্তু প্রযত্ন নীতিবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে সেই ব্যক্তির পরিস্থিতি, তার দায়িত্ববোধ এবং সম্পর্কের প্রতি তার অঙ্গীকার— এসব বিষয়ও বিবেচনার আওতাভুক্ত হয়। ফলে নৈতিক বিচার আরও মানবিক ও বাস্তবভিত্তিক হয়ে ওঠে।
এই প্রসঙ্গে জোয়ান ট্রোনটো তাঁর *An Ethic of Care* প্রবন্ধে প্রযত্নের চারটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন।[v]
প্রথমত, Attentiveness (মনোযোগিত্ব)— যার প্রতি যত্ন নেওয়া হচ্ছে তার বিশেষ চাহিদার প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেওয়া। অন্যের প্রয়োজনের প্রতি এই সংবেদনশীলতা না থাকলে সমাজে সহিংসতা ও নিষ্ঠুরতার পরিবেশ তৈরি হতে পারে।
দ্বিতীয়ত, Responsibility (দায়িত্ববোধ)— অন্যের প্রয়োজনের প্রতি দায়িত্বশীলভাবে সাড়া দেওয়া। এই দায়িত্ব কেবল প্রতিষ্ঠিত নিয়মের বাধ্যবাধকতা থেকে নয়, বরং মানবিক সহমর্মিতা ও নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকেও উদ্ভূত হতে পারে।
তৃতীয়ত, Competence (সামর্থ্য)— শুধু দায়িত্ব অনুভব করাই যথেষ্ট নয়; সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার সক্ষমতাও থাকতে হবে।
চতুর্থত, Responsiveness (প্রতিদেয়তা বা প্রতিক্রিয়াশীলতা)— যিনি প্রযত্ন গ্রহণ করছেন, তিনিও প্রযত্নদাতার প্রতি সংবেদনশীল হবেন এবং সেই সম্পর্কের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া গড়ে উঠবে।

এই চারটি উপাদান থেকে বোঝা যায় যে প্রযত্ন নীতিবিদ্যা মানবিক সম্পর্ক, পারস্পরিক নির্ভরতা এবং দায়িত্ববোধের উপর ভিত্তি করে নৈতিকতার একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান করে।

এছাড়াও প্রযত্ন নীতিবিদ্যার আলোচনায় নেল নডিংসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রযত্ন নীতিবিদ্যার ধারণাকে আরও সুসংগঠিত করেন। তাঁর মতে নৈতিকতার মূল ভিত্তি হলো *caring relationship*। একজন ব্যক্তি তখনই নৈতিকভাবে দায়িত্বশীল হয়ে ওঠে যখন সে অন্যের প্রয়োজন ও অনুভূতির প্রতি সংবেদনশীল হয়।[vi]

সারসংক্ষেপে বলা যায়, প্রযত্ন নীতিবিদ্যার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

১. নৈতিকতার ভিত্তি হিসেবে সম্পর্কের গুরুত্ব
২. সহমর্মিতা ও আবেগের ভূমিকা

৩. যত্ন ও দায়িত্ববোধ
৪. পরিস্থিতিনির্ভর নৈতিক বিচার

এই দৃষ্টিভঙ্গি নৈতিকতাকে কেবল নিয়ম বা কর্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে আরও মানবিক, বাস্তবসম্মত এবং সম্পর্কভিত্তিক করে তোলে।

গান্ধীজির নারীচিন্তা:

ভারতীয় সমাজচিন্তায় মহাত্মা গান্ধীর নারীসম্পর্কিত ভাবনা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। তাঁর মতে কোনো দেশের প্রকৃত সম্পদ হল মানুষ, এবং সেই মানবসমাজের অর্ধাংশ হল নারী। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারের কারণে নারীরা সমাজে অবমাননা ও দাসত্বের শিকার হয়েছে। এই বাস্তবতা উপলব্ধি করেই গান্ধীজি নারীকে সামাজিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করে প্রকৃত মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি নারীকে সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক শক্তি হিসেবে বিবেচনা করেন এবং মনে করেন যে সহনশীলতা, প্রেম, আত্মত্যাগ এবং সহমর্মিতার মতো গুণাবলি নারীর মধ্যে বিশেষভাবে বিকশিত হয়, যা সমাজে নৈতিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম।

গান্ধীজি প্রথমেই সেইসব ধর্মশাস্ত্রের সমালোচনা করেন যেখানে নারীর মর্যাদাকে অবমাননা করা হয়েছে। ভারতবর্ষে ধর্ম মানুষের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেও তিনি অন্ধভাবে ধর্মীয় শাস্ত্রকে গ্রহণ করার পক্ষে ছিলেন না। তিনি মনুস্মৃতির কিছু উক্তিকে 'তথাকথিত' বলে উল্লেখ করেন এবং মনে করেন যে নারীর প্রতি অবমাননাকর বহু শ্লোক পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। কারণ একই শাস্ত্রের মধ্যেই আবার বলা হয়েছে—"যেখানে নারী পূজিতা, সেখানে দেবতাও প্রসন্ন হন।" তাই গান্ধীর মতে ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা; যে কোনো শাস্ত্রীয় উক্তি যদি মানবিক ন্যায় ও নৈতিকতার পরিপন্থী হয় তবে তাকে বর্জন করা উচিত।

ধর্মশাস্ত্রের সমালোচনার পাশাপাশি তিনি সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কুপ্রথার বিরুদ্ধেও সোচ্চার হন। বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, বাধ্যতামূলক বৈধব্য, দেবদাসী প্রথা, পর্দা প্রথা এবং নারীর আর্থিক পরাধীনতার মতো সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেন। তাঁর মতে নারীকে পুরুষের অধীনস্থ বা ভোগের বস্তু হিসেবে দেখার মানসিকতা সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের লক্ষণ। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন যে নারী পুরুষের দাসী নয়, বরং তার সহযোগী ও সহকর্মী।

বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে গান্ধীজির অবস্থান ছিল অত্যন্ত কঠোর। তিনি মনে করতেন যে কন্যা কোনো পিতার সম্পত্তি নয় যে তাকে ইচ্ছামতো দান করা যাবে। পিতা সন্তানের রক্ষক মাত্র, মালিক নয়। অল্পবয়স্কা মেয়েদের বিবাহকে তিনি নৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করতেন এবং একে অনেকাংশে পুরুষের ভোগকেন্দ্রিক মানসিকতার ফল হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে বিবাহ একটি পবিত্র সামাজিক বন্ধন, যেখানে নারী ও পুরুষ উভয়ের সমান মর্যাদা ও অধিকার থাকা উচিত এবং উভয়েরই নিজের জীবনসঙ্গী নির্বাচন করার স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন।

পণপ্রথার বিরুদ্ধেও গান্ধীজি কঠোর সমালোচনা করেন। তাঁর মতে বিবাহ কোনো বেচাকেনার সম্পর্ক নয়; বরং এটি একটি পবিত্র সামাজিক প্রতিষ্ঠান। পণ গ্রহণকে তিনি "নিষ্ঠুর সামাজিক প্রথা" এবং "আত্মবিক্রয়"-এর সমতুল্য বলে আখ্যায়িত করেন। তাঁর মতে যে পুরুষ বিবাহের শর্ত হিসেবে পণ গ্রহণ করে সে কেবল নারীর মর্যাদাকেই অপমান করে না, বরং নিজের শিক্ষাকেও অবমানিত করে।

নারীর সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন। তাঁর মতে সম্পত্তির পূর্ণ অধিকার পুরুষকে সামাজিক ক্ষমতা প্রদান করে এবং সেই ক্ষমতার অপব্যবহার থেকেই নারীর উপর অত্যাচারের জন্ম হয়। তাই নারীদেরও পিতৃসম্পত্তির ভোগ ও অধিকার থাকা প্রয়োজন বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

বিধবা নারীর অবস্থান সম্পর্কেও গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বিধবা বিবাহকে কোনো পাপ বলে মনে করেননি এবং বলেছেন যে যদি বিধবা বিবাহ পাপ হয় তবে বিপত্নীক পুরুষের পুনর্বিবাহও একইভাবে পাপ হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধেও তিনি অবস্থান গ্রহণ করেন এবং মনে করেন স্বামীর মৃত্যুর পর আত্মাহুতি দেওয়ার মধ্যে প্রকৃত সতীত্ব নেই; বরং সংযমপূর্ণ জীবনযাপনই প্রকৃত নৈতিকতার পরিচায়ক।

নারীমুক্তির জন্য গান্ধীজি নারীশিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে নিরক্ষরতার অজুহাতে নারীদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কোনো নৈতিক ভিত্তি নেই। শিক্ষা নারীদের আত্মসচেতন করে তুলবে এবং তাদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে বিকশিত করতে সাহায্য করবে। তবে তিনি এমন শিক্ষা ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন যা কেবল নারীদের আদর্শ স্ত্রী বা মাতা হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে। তাঁর মতে নারীশিক্ষা এমন হওয়া উচিত যা তাদের ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ঘটাবে এবং সমাজজীবনে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দেবে।

নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকেও তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন। তাঁর মতে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা ছাড়া প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। এই কারণেই তিনি চরকা আন্দোলনের মাধ্যমে নারীদের উৎপাদনমূলক কাজে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে চরকা কেবল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নয়, বরং আত্মনির্ভরতা ও মর্যাদাবোধের প্রতীক।

গান্ধীজি নারীর রাজনৈতিক অধিকারের বিষয়েও সচেতন ছিলেন। তিনি মনে করতেন রাজনৈতিক স্বাধীনতা তখনই অর্থবহ হবে যখন নারীরাও স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারবে এবং রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। এই কারণে তিনি নারীদের ভোটাধিকারের পক্ষেও মত প্রকাশ করেন।

সার্বিকভাবে বলা যায়, গান্ধীজি নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মতে নারীরা স্বভাবতই অহিংসার আদর্শের সঙ্গে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সহমর্মিতা, আত্মত্যাগ ও সেবার মতো গুণাবলি সমাজে নৈতিক পরিবর্তনের শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। যদিও তাঁর চিন্তায় মাতৃত্ব ও আত্মত্যাগের ধারণা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে, তবুও তিনি নারীর মর্যাদা, স্বাধীনতা এবং নৈতিক শক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

প্রযত্ন নীতিবিদ্যার আলোকে গান্ধীজির নারীচিন্তার বিশ্লেষণ:

প্রযত্ন নীতিবিদ্যার আলোকে গান্ধীজির নারীচিন্তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তাঁর চিন্তায় বহু উপাদান এই নীতিবিদ্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যপূর্ণ। প্রযত্ন নীতিবিদ্যা যেমন সহমর্মিতা, যত্ন, দায়িত্ববোধ, আত্মত্যাগ ও পারস্পরিক নির্ভরতার উপর নৈতিকতার ভিত্তি স্থাপন করে, গান্ধীজিও তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শনে এই গুণগুলির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

গান্ধীজির অহিংসামূলক আন্দোলনের মধ্যেই এই প্রযত্নমূলক নৈতিকতার প্রভাব সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। তিনি সশস্ত্র সংগ্রামের পরিবর্তে অহিংসাকে জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মতে সমাজে নৈতিক পরিবর্তন আনতে হলে সেবা, যত্ন, সহানুভূতি, সততা, আত্মসংযম, দায়িত্বশীলতা ও আত্মত্যাগের মতো গুণগুলির বিকাশ অপরিহার্য। এই গুণগুলি সমাজে শান্তি ও সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং মানবিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে তোলে।

এই প্রেক্ষাপটে গান্ধীজি মনে করতেন যে স্বাধীনতা আন্দোলনের সাফল্যের জন্য এমন মানুষদের প্রয়োজন যারা এই নৈতিক গুণগুলির অধিকারী। তাঁর মতে অহিংস সংগ্রাম কেবল বাহুবলের উপর নির্ভর করে না; বরং এটি নৈতিক শক্তি, আত্মসংযম এবং আত্মত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই তিনি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন।

গান্ধীজি বিশেষভাবে নারীদের এই আন্দোলনে অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর মতে নারীদের মধ্যে সহনশীলতা, ধৈর্য, সহানুভূতি এবং আত্মত্যাগের যে স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে তা অহিংস সংগ্রামের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মনে করতেন পুরুষেরা অনেক সময় সামাজিক সংস্কার ও ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষার কারণে হিংসাত্মক মনোভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়, কিন্তু নারীরা তাদের সহৃদয়তা ও ধৈর্যের দ্বারা অহিংস আন্দোলনের শক্তিকে সুদৃঢ় করতে পারে। এই কারণেই তিনি বলেছিলেন— "ভারতবর্ষের মুক্তি ভারতবর্ষের ত্যাগ ও জাগৃতির উপর নির্ভর করে।"

এছাড়াও তিনি নারীদের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছিলেন— "আমার ভবিষ্যৎ সেনাদলে পুরুষ অপেক্ষা নারীর বিপুল সংখ্যাধিক্য দেখতে আমি ইচ্ছা করি... পুরুষের হিংসাবৃত্তিকে আমি অত্যন্ত ভয় করি।" এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে অহিংস সংগ্রামের ক্ষেত্রে নারীদের নৈতিক শক্তি বিশেষভাবে কার্যকর। তাঁর মতে পুরুষরা বাহুশক্তিতে এগিয়ে থাকলেও আত্মত্যাগের শক্তিতে নারীরা অধিক বলীয়সী। তিনি বলেন— "আমি বিশ্বাস করি, পুরুষ যেমন পশুশক্তি প্রণোদিত সাহসে নারী হইতে শ্রেষ্ঠ, নারীও সকল সময় আত্মত্যাগের শক্তিতে পুরুষের চেয়ে অধিক বলীয়সী।"

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্পষ্ট হয় যে গান্ধীজি তথাকথিত "নারীসুলভ" গুণগুলিকে হেয় করে দেখেননি; বরং তিনি মনে করেছিলেন এই গুণগুলি মানবজাতির আদর্শ গুণ হওয়া উচিত। তাঁর মতে সহমর্মিতা, সেবা, ধৈর্য ও আত্মত্যাগ কেবল নারীর বৈশিষ্ট্য নয়; বরং এগুলি মানবিক নৈতিকতার মৌলিক উপাদান।

প্রযত্ন নীতিবিদ্যার সঙ্গে গান্ধীজির চিন্তার এই সাদৃশ্য আরও স্পষ্ট হয় তাঁর 'সেবা' ধারণায়। প্রযত্ন নীতিবিদ্যা যেমন নৈতিকতার ভিত্তি হিসেবে caring relationship-এর উপর গুরুত্ব দেয়, গান্ধীজিও সমাজে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সেবার আদর্শকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর মতে অন্যের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করা মানবজীবনের অন্যতম নৈতিক কর্তব্য।

তবে গান্ধীজির নারীচিন্তার কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। অনেক সমালোচকের মতে তিনি কখনো কখনো নারীর ভূমিকা মাতৃত্ব, সেবা এবং আত্মত্যাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেখেছেন। আধুনিক নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গি সমালোচিত হয়েছে, কারণ এতে নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং স্বতন্ত্র সত্তার প্রশ্নটি সবসময় সমান গুরুত্ব পায় না।

তবুও সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে গান্ধীজির নারীচিন্তায় প্রযত্ন নীতিবিদ্যার সঙ্গে গভীর সাদৃশ্য বিদ্যমান। তিনি সহমর্মিতা, যত্ন, সেবা, আত্মত্যাগ এবং অহিংসার মতো মূল্যবোধকে মানবসমাজের নৈতিক ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এবং এই গুণগুলির মাধ্যমে নারীকে সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

দার্শনিক মূল্যায়ন:

প্রযত্ন নীতিবিদ্যা নৈতিকতাকে কেবল নিয়ম বা কর্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে না; বরং মানবিক সম্পর্ক, সহমর্মিতা এবং পারস্পরিক দায়িত্ববোধের ভিত্তিতে নৈতিকতার একটি বিকল্প ব্যাখ্যা প্রদান করে। এই নীতিবিদ্যার মূল লক্ষ্য হল নৈতিকতাকে বাস্তব জীবনের সম্পর্কের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা এবং যত্ন, সহানুভূতি,

দায়িত্ববোধ ও পারস্পরিক নির্ভরতার গুরুত্বকে তুলে ধরা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে নৈতিক জীবনকে আরও মানবিক এবং বাস্তবসম্মত রূপে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়।

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে গান্ধীর নারীচিন্তা প্রযত্ন নীতিবিদ্যার সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ তৈরি করে। তাঁর অহিংসা, প্রেম, সহমর্মিতা এবং সেবার ধারণা মূলত মানবিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। গান্ধীজি মনে করতেন যে সত্য ও অহিংসার আদর্শ অনুসরণ করার জন্য মানুষের মধ্যে সহমর্মিতা, আত্মসংযম এবং অপরের কল্যাণের প্রতি দায়িত্ববোধ থাকা আবশ্যক। এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রযত্ন নীতিবিদ্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, কারণ এখানেও নৈতিকতার ভিত্তি হিসেবে caring relationship এবং পারস্পরিক নির্ভরতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

তবে একই সঙ্গে এটাও বলা যায় যে গান্ধীর নারীচিন্তা সম্পূর্ণরূপে আধুনিক নারীবাদী নীতিবিদ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আধুনিক feminist ethics সাধারণত নারীর স্বাধীনতা, সমতা এবং স্বায়ত্তশাসনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে গান্ধীর চিন্তার কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমত, গান্ধীজি প্রায়ই নারীর নৈতিক শক্তিকে তার মাতৃত্ব, সেবা এবং আত্মত্যাগের গুণাবলীর সঙ্গে যুক্ত করেছেন। তিনি মনে করতেন নারীরা স্বভাবতই সহনশীল, সহৃদয় এবং আত্মত্যাগে সক্ষম। যদিও এই ধারণা নারীর নৈতিক মর্যাদাকে স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু আধুনিক নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটি সমস্যাজনক বলে বিবেচিত হতে পারে। কারণ এতে নারীর পরিচয় অনেক সময় একটি নির্দিষ্ট সামাজিক ভূমিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং নারীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার প্রশ্নটি সবার অবলোকনেই থেকে যায়।

দ্বিতীয়ত, আধুনিক feminist ethics নারীর স্বায়ত্তশাসন বা autonomy-কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। অর্থাৎ নারীরা নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়ার অধিকার রাখে এবং সামাজিক বা সাংস্কৃতিক প্রত্যাশার দ্বারা সেই স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত নয়। কিন্তু গান্ধীর চিন্তায় অনেক ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা সমাজের নৈতিক উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ফলে নারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতার চেয়ে তার সামাজিক বা নৈতিক ভূমিকার উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হয়।

তৃতীয়ত, আধুনিক নারীবাদী নীতিবিদ্যায় লিঙ্গসমতার প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। feminist ethics পুরুষ ও নারীর সমান সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেয়। যদিও গান্ধীজি নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং নারীদের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন, তবুও তাঁর চিন্তায় অনেক সময় নারীর নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নারীর ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দিলেও, এটি কখনও কখনও নারীর উপর অতিরিক্ত নৈতিক প্রত্যাশা আরোপ করতে পারে।

এই কারণেই বলা যায় যে গান্ধীর নারীচিন্তা এবং আধুনিক feminist ethics-এর মধ্যে একদিকে যেমন কিছু সাদৃশ্য রয়েছে, অন্যদিকে তেমনি কিছু মৌলিক পার্থক্যও বিদ্যমান। গান্ধীজি প্রযত্ন, সহমর্মিতা এবং অহিংসার মতো মূল্যবোধকে নৈতিকতার কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করেছিলেন, যা প্রযত্ন নীতিবিদ্যার সঙ্গে গভীরভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু আধুনিক নারীবাদী নীতিবিদ্যা এই মূল্যবোধগুলির পাশাপাশি নারীর স্বাধীনতা, সমতা এবং স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নকেও সমান গুরুত্ব দেয়।

সুতরাং বলা যায় যে গান্ধীর নারীচিন্তা প্রযত্ন নীতিবিদ্যার সঙ্গে আংশিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও তা সম্পূর্ণরূপে আধুনিক feminist ethics-এর সঙ্গে মিলে যায় না। বরং এই দুই চিন্তাধারার মধ্যে একটি

সমালোচনামূলক আলোচনা সম্ভব, যা নৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারে এবং নারী, নৈতিকতা ও সমাজ সম্পর্কে একটি অধিকতর সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সহায়তা করতে পারে।

সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা:

বর্তমান সমাজে নারী-পুরুষ সমতার প্রশ্নটি বিশ্বব্যাপী আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদিও আধুনিক যুগে নারীরা শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং বিভিন্ন পেশাগত ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে, তবুও সামাজিক বাস্তবতায় এখনও নানা ধরনের বৈষম্য এবং সহিংসতার ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। কন্যাভ্রূণ হত্যা, পণপ্রথা, পারিবারিক সহিংসতা, কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য এবং নারীর প্রতি সামাজিক অবমাননার মতো সমস্যাগুলি আজও বিভিন্ন সমাজে বিদ্যমান। এই প্রেক্ষাপটে মহাত্মা গান্ধীর নারীচিন্তা এবং প্রযত্ন নীতিবিদ্যার ধারণা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

প্রথমত, সমকালীন সমাজে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা। ভারতের ক্ষেত্রে National Crime Records Bureau (NCRB)-এর প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক নারী পারিবারিক সহিংসতা, পণজনিত নির্যাতন এবং যৌন সহিংসতার শিকার হন।[vii] এই পরিস্থিতিতে গান্ধীর অহিংসা এবং সহমর্মিতার নৈতিক আদর্শ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প নৈতিক পথ নির্দেশ করতে পারে। তাঁর মতে সমাজে স্থায়ী পরিবর্তন আনতে হলে সহিংসতার পরিবর্তে সহমর্মিতা, সহিষ্ণুতা এবং মানবিক দায়িত্ববোধের বিকাশ অপরিহার্য। এই দৃষ্টিভঙ্গি আজকের সমাজে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে নৈতিক সচেতনতা গড়ে তুলতে সহায়ক হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, সমকালীন বিশ্বে নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। United Nations Women-এর বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা যায় যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে নারীরা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করলেও এখনও বহু দেশে তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার।[viii] এই প্রেক্ষাপটে গান্ধীর নারীশিক্ষা, আত্মনির্ভরতা এবং সামাজিক অংশগ্রহণের উপর জোর আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তিনি মনে করতেন যে নারীর প্রকৃত মুক্তি তখনই সম্ভব যখন তারা শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মাধ্যমে আত্মনির্ভর হয়ে উঠবে এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

তৃতীয়ত, সমসাময়িক নারীবাদী আলোচনায় "care economy" একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে। অর্থনীতিবিদ বিনা আগরওয়াল দেখিয়েছেন যে সমাজে যত্ন ও পরিচর্যার কাজ— যেমন শিশু, বৃদ্ধ বা অসুস্থ ব্যক্তির যত্ন নেওয়া— প্রধানত নারীরাই সম্পাদন করে থাকেন, কিন্তু এই কাজগুলির যথাযথ সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন করা হয় না।[ix] এই ধারণা প্রযত্ন নীতিবিদ্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, কারণ এই নীতিবিদ্যা মানবিক সম্পর্ক, যত্ন এবং পারস্পরিক দায়িত্ববোধকে নৈতিকতার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করে। গান্ধীর 'সেবা এবং 'সহমর্মিতা- ভিত্তিক নৈতিকতা এই আলোচনার সঙ্গে একটি তাৎপর্যপূর্ণ সংযোগ তৈরি করে।

এইসব আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে গান্ধীর নারীচিন্তা এবং প্রযত্ন নীতিবিদ্যার ধারণা কেবল ঐতিহাসিক বা দার্শনিক আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা সমকালীন সমাজের নৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলির বিশ্লেষণেও গুরুত্বপূর্ণ দিশা প্রদান করতে পারে। নারী-পুরুষ সমতা, মানবিক সম্পর্ক এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই চিন্তাধারাগুলি আজও গভীর প্রাসঙ্গিকতা বহন করে।

উপসংহার:

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে মহাত্মা গান্ধীর নারীচিন্তা ভারতীয় সমাজচিন্তা এবং নৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক প্রথা, ধর্মীয় কুসংস্কার এবং পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার কারণে নারীরা সমাজে অবমাননা ও দাসত্বের শিকার হয়েছে। এই বাস্তবতার প্রতি সচেতন হয়েই তিনি নারীদের পশুত্বরূপ দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে তাদের প্রকৃত মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মতে দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা তখনই অর্থবহ হবে যখন নারী-পুরুষ উভয়েই সমান মর্যাদা ও অধিকার ভোগ করতে পারবে।

এই কারণেই স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তিনি নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলন, খিলাফৎ আন্দোলন এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনে বিপুল সংখ্যক নারী অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং সমাজের অন্তর্জগতের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে জাতীয় জীবনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। গান্ধীজির নেতৃত্বেই ১৯২৫ সালে সরোজিনী নাইডু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে আসীন হন, যা ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসে নারী অংশগ্রহণের এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

গান্ধীজির নারীচিন্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তিনি তথাকথিত "নারীসুলভ" বলে বিবেচিত গুণাবলিকে হেয় করে দেখেননি। বরং তিনি মনে করতেন সহমর্মিতা, সেবা, আত্মত্যাগ, ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতার মতো গুণাবলি মানবসমাজের নৈতিক উন্নতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রযত্ন নীতিবিদ্যার সঙ্গে গভীরভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ, কারণ প্রযত্ন নীতিবিদ্যাও নৈতিকতার ভিত্তি হিসেবে মানবিক সম্পর্ক, যত্ন এবং পারস্পরিক দায়িত্ববোধের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। গান্ধীর অহিংসা, প্রেম এবং সেবার ধারণা এই মানবিক মূল্যবোধের উপরই প্রতিষ্ঠিত। তাঁর মতে সমাজে ন্যায়, শান্তি এবং মানবিকতার পরিবেশ গড়ে তুলতে এই গুণাবলির বিকাশ অপরিহার্য।

তবে আধুনিক নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে গান্ধীর নারীচিন্তার কিছু সীমাবদ্ধতাও লক্ষ্য করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে তিনি নারীর নৈতিক শক্তিকে মাতৃত্ব, সেবা এবং আত্মত্যাগের গুণাবলির সঙ্গে যুক্ত করেছেন, যা কখনও কখনও নারীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা এবং স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নকে আংশিকভাবে আড়াল করে দিতে পারে। আধুনিক feminist ethics নারীর স্বাধীনতা, সমতা এবং স্বায়ত্তশাসনের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়। তবুও এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গান্ধীর নারীচিন্তা নারী-মুক্তি এবং নৈতিক দর্শনের আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশ করে। এই প্রসঙ্গে গান্ধীর একটি উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

> "Woman is the companion of man, gifted with equal mental capacities. She has the right to participate in the minutest details of the activities of man."[x]

এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে গান্ধী নারীকে সমাজের সমান অংশীদার হিসেবে দেখেছিলেন এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক জীবনে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে সমর্থন করেছিলেন। আজকের সমাজে যখন একদিকে নারীরা রাষ্ট্রপরিচালনা থেকে শুরু করে শিক্ষা, বিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, অন্যদিকে এখনও অনেক স্থানে কন্যাসন্তান অবহেলা, পণপ্রথা এবং নারী নির্যাতনের মতো সমস্যা বিদ্যমান— এই প্রেক্ষাপটে গান্ধীর নারীচিন্তা নতুনভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

সুতরাং বলা যায় যে প্রযত্ন নীতিবিদ্যার আলোকে গান্ধীর নারীচিন্তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাঁর নৈতিক দর্শন মানবিক সম্পর্ক, সহমর্মিতা এবং দায়িত্ববোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। যদিও আধুনিক নারীবাদী নীতিবিদ্যার

সঙ্গে তাঁর চিন্তার সম্পূর্ণ মিল নেই, তবুও এই দুই চিন্তাধারার মধ্যে একটি সৃজনশীল সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব। এই সৃজনশীল সম্পর্কের মাধ্যমে নৈতিক দর্শন, নারীবাদ এবং সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্নকে আরও গভীরভাবে অনুধাবন করা সম্ভব এবং সমকালীন সমাজে নারী-পুরুষ সমতার আদর্শ প্রতিষ্ঠায় তা গুরুত্বপূর্ণ দিশা প্রদান করতে পারে।

---

[i] Alison Jaggar, *Feminist Ethics,* Oxford University Press.
[ii] Raghavan Iyer, *The Moral and Political Thought of Mahatma Gandhi.*
[iii] M.K. Gandhi, *Young India*, 1921.
[iv] Carol Gilligan, *In a Different Voice,* Harvard University Press, 1982
[v] Joan Tronto, An Ethics of Care, Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care (New York: Routledge, 1993).
[vi] Nel Noddlings, *Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education*, 1984.
[vii] Government of India**, National Crime Records Bureau**, *Crime in India Report 2022* (New Delhi: Ministry of Home Affairs, 2023)
[viii] **UN Women,** *Progress on the Sustainable Development Goals: Gender Equality Snapshot 2023* (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, 2023)
[ix] Bina Agarwal, "Gender Equality and Women's Empowerment," *World Development Report* (Washinton D.C.: World Bank, 2012).
[x] M.K. Gandhi*, Harijan*, 1931.

গ্রন্থপঞ্জি:

১. গান্ধী, মহাত্মা করমচাঁদ। নারী ও সমাজ ভাবনা। নবজীবন পাবলিশিং হাউস, ১৯৬২, আহমেদাবাদ, পৃ. ২৫।

২. তদেব, পৃ. ৩২।

৩. গান্ধী, মহাত্মা করমচাঁদ। *Young India* (নির্বাচিত রচনা) । নবজীবন ট্রাস্ট, ১৯২৫, আহমেদাবাদ, পৃ. ৫৪।

৪. গিলিগান, ক্যারোল। In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮২, কেমব্রিজ, পৃ. ৪১।

৫. নডিংস, নেল। Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education। ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, ১৯৮৪, বার্কলে, পৃ. ১৭।

৬. ট্রোনটো, জোয়ান। Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care। রাউটলেজ, ১৯৯৩, নিউইয়র্ক, পৃ. ১২৭।

৭. আগরওয়াল, বিনা। Gender Equality and Women's Empowerment। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক পাবলিকেশন, ২০১২, ওয়াশিংটন ডিসি, পৃ. ৬৫।

৮. ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো। Crime in India Report। ভারত সরকার, ২০২২, নয়া দিল্লি, পৃ. ১০৪।

৯. ইউনাইটেড নেশন্স উইমেন। Progress on the Sustainable Development Goals: Gender Equality Report। ইউনাইটেড নেশন্স পাবলিকেশন, ২০২৩, নিউইয়র্ক, পৃ. ২৯।